বুড়িগঙ্গা তীরের রহস্যনগরী

পর্যটকদের চোখে প্রাচ্যের রানী ঢাকা–

সৈয়দ আবদাল আহমদ ॥ প্রাচ্যের রানী ঢাকা। এক সময় বুড়িগঙ্গা তীরের এই বিচিত্র নগরীকে এ নামেই ডাকা হতো। পরিবর্তনশীল ভাগ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গড়ে ওঠা এই নগরী আকর্ষণ করেছে বহু বিদেশী পর্যটক আর দুনিয়ার বিখ্যাত সব মানুষকে। এই নগরীর মায়াবী আকর্ষণে তাঁরা ছুটে এসেছেন এখানে হাজার হাজার মাইল দুর্গম পথ পেরিয়ে। এদের কেউ এসেছেন মোগল যুগে, কেউ এসেছেন ব্রিটিশ যুগে। আবার কেউবা পাকিস্তান শাসনামলে কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমানকালে ঢাকা সফর করেছেন। অনেকে লিখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা, এই নগরীর জীবনধারার কথা।

ভ্রমণকারী পর্তুগীজ যাজক সিবাস্টিয়ান ম্যানরিখ ১৬৪০ সালের দিকে ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা শহরে তাঁর অবস্থানকাল ছিল ২৭ দিন। এই অল্প কয়দিনে তিনি যা দেখেছেন এবং শুনেছেন তা লিখে গেছেন। ওই সময়ের শহরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ম্যানরিখ মন্তব্য করেন–"এটিই হচ্ছে বাংলার প্রধান শহর আর দেশের সবচেয়ে উচ্চ পদাধিকারী নবাব বা ভাইসরয় বা প্রতিনিধির কার্যস্থল, যাকে সম্রাট নিয়োগ দেন। এই প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সম্রাট বেশ কয়েকবারই তাঁর নিজস্ব কোন সন্তানের ওপরই অর্পণ করেন। এই নগরীটি বিরাট এবং অতি সুন্দর এক সমতল ভূমিতে, বিখ্যাত ও এখানে ফলবান গঙ্গা (বুড়িগঙ্গা) নদীর পাড়ে অবস্থিত। এর পাড় ঘেঁষেই শহরটি প্রায় দেড়লীগ (প্রায় সোয়া পাঁচ মাইল)-এর বেশি স্থান পর্যন্ত প্রসারিত। অনেক বিচিত্র জাতির মানুষ এই শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আসে। নানা ধরনের পণ্যের বিরাট ব্যবসা এখানে হয়। এ সকল পণ্য বেশিরভাগই এ অঞ্চলের উত্তম ও অতি উর্বর ভূমি থেকেই উৎপাদিত হয়। এই ব্যবসা-বাণিজ্য নগরটির জন্য এত ধনসম্পত্তি এনেছে যা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়। বিশেষ করে এখানকার যাত্রীদের (মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের) বাড়িতে যে পরিমাণ টাকা আছে তা গণনা করা অসম্ভব ভেবে এগুলো ওজন করা হয়। আমাকে বলা হয়েছে, গাঙ্গেয় এই বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র এবং এর উপকণ্ঠে দুই লক্ষেরও অধিক লোক বাস করে। বিস্মিত হওয়ার আরও কারণ রয়েছে, আর তা হলো প্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্রের বিপুল সরবরাহ। এর বিভিন্ন বাজারে এমন কোন পণ্য নাই, যা মানুষের কামনার বাইরে। এই নগর থেকে সম্রাট এবং অন্যান্য মোগল শাসনকর্তা যে পরিমাণ আর্থিক সুবিধা লাভ করেন তা অবিশ্বাস্য। শুধু এটুকুই বলতে চাই যে, কেবল মাত্র পান বা ভারতীয় পাতা থেকেই তারা প্রতিদিন ৪ হাজার রুপী শুল্ক পেয়ে থাকে।" ম্যানরিখ আরও উল্লেখ করেন যে, "এ অঞ্চলেই সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং উৎকৃষ্ট মসলিন তৈরি হয়। ৫০ থেকে ৬০ গজ লম্বা আর ৭ থেকে ৮ হাত চওড়া এ সকল কাপড়ের অনেকগুলোতে সোনালী ও রূপালী রঙের রেশমের পাড় আছে। এসব বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে ব্যবসায়ীরা এক হাত লম্বা ফাঁকা বাঁশের ভিতরে এগুলো ঢুকিয়ে বিভিন্ন স্থানে বিতরণের জন্য নিরাপদে বহন করতে পারত। আর এরূপ দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে এগুলো খোরাসান, পারস্য, তুরস্কসহ দূরদূরান্তের দেশে নিয়ে যায়।" ঢাকার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে ম্যানরিখ লিখেছেন, এটা এত ব্যাপক ছিল যে, এক 'শরও বেশি পণ্যভর্তি জাহাজ বিদেশে চালান যেত। রফতানি পণ্যের মধ্যে কাপড়, চাল, চিনি, তেল ছিল প্রধান। ১৬৬৩ সালে ইতালীয় পর্যটক ও ঐতিহাসিক নিকোলা মানুচ্চি ঢাকায় আসেন। স্বল্পদিন অবস্থান করেন তিনি। ঢাকাকে তিনি মাঝারি ধরনের শহর হিসাবে উল্লেখ করেন। তবে আয়তনের তুলনায় তখন লোকসংখ্যা ছিল বেশি। তিনি লিখেছেন, ঢাকার অধিকাংশ বাড়িঘরই খড়ের তৈরি। তবে কিছু কিছু ইটের তৈরি বাড়িঘরও ছিল। সেগুলো বেশিরভাগই বিদেশীদের। বিদেশী বাসিন্দাদের মধ্যে ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং পর্তুগীজদের সংখ্যা ছিল বেশি।

ফরাসী ব্যবসায়ী পর্যটক টাভার্নিয়ার ১৬৬৬ সালে প্রাচ্যের রহস্যনগরী ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকায় তাঁর অবস্থানকাল ছিল মাত্র ষোল দিন। এ স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় তিনি দু'বার নবাব শায়েস্তা খানের সঙ্গে দেখা করেন এবং ফ্রান্স থেকে তিনি যেসব অলঙ্কার ও রত্নাদি এনেছিলেন তা বিক্রি করেন। ঢাকা ছেড়ে যাবার সময় তিনি প্রায় ১১ হাজার টাকা মূল্যের পণ্যসামগ্রী ক্রয় করেন। টাভার্নিয়ার ঢাকাকে অনেক বড় শহর বলে উল্লেখ করেন। দৈর্ঘ্য ছয় মাইলেরও বেশি। শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, এদের অধিকাংশ কাঠমিস্ত্রী, নৌকা তৈরি করা এদের প্রধান কাজ। বাঁশ ও কাদামাটির

তৈরি বাড়িঘরে এরা বসবাস করে। টাভার্নিয়ার এ বাড়িগুলোকে মুরগির ঘর বলে মন্তব্য করেন। টাভার্নিয়ার ঢাকাকে একটি বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে বর্ণনা করে লেখেন, মোগল সাম্রাজ্যের ১২টি বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।

১৮২৪ সালে কলকাতার বিশপ রেভারেন্ড হেবার ঢাকা শহরে আসেন। এখানে ২২ দিন তিনি অবস্থান করেন। হেবারের ভাষায় ঃ যে নদীর তীরে ঢাকা অবস্থিত তার রূপ অনেক বদলে গেছে। রেনেলের মানচিত্রের সঙ্গে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই সময় এই নদীটা ছিল সরু কিন্তু এখন এমনকি গ্রীষ্মকালেও কলকাতার হুগলী নদীর চেয়ে কোন অংশে ছোট নয়। ঢাকায় হেবার তৎকালীন কালেক্টর মি. মাস্টারের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে শোনা ঢাকার বর্ণনা থেকে হেবার লিখেছেন, ঢাকা এখন প্রাচীন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এর বাণিজ্য পূর্বাপেক্ষা ষাট ভাগ কমে গেছে। ঢাকার সুরম্য অট্টালিকা, শাহ জাহাঙ্গীর নির্মিত দুর্গ, তাঁর তৈরি মসজিদ, প্রাচীন নবাবদের রাজপ্রাসাদসমূহ, ওলন্দাজ, ফরাসী এবং পর্তুগীজদের ফ্যাক্টরি ও চার্চ সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং জঙ্গলে ঢেকে গেছে। মোগল যুগের ঢাকা থেকে কোম্পানি আমলের ঢাকার অনেক পার্থক্য তাঁর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।

১৮৪০ সালে ঢাকায় আসেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের লে. কর্নেল সিজেসি ডেভিডসন। দূর থেকে আবছাভাবে ডেভিডসনের চোখে পড়ল ঢাকা। চারদিকে ঘন কুয়াশা। এর মধ্যে যে জিনিসটি নজরে এলো তা হলো শহরের বিপরীতে নদীর পশ্চিম দিকে উঁচু ও স্থায়ী এক দোতলা বাড়ি। শহরটি বুড়িগঙ্গার পূর্ব তীরে। লম্বায় হবে প্রায় দু'মাইল। তিন-চার মাইল দূর থেকে বা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেও ভারি সুন্দর দেখায় শহরটি। ঢাকায় পা রেখে ডেভিডসন দেখলেন, এক টাকা খরচ করলে পাওয়া যায় ২৫৬টি কমলা আর দু'টাকা খরচ করলে একটি বেহালা। দিন-রাত সারাক্ষণ ঢাকায় শোনা যায় বেহালার সুর। আবার এও দেখলেন, অরণ্য গ্রাস করছে শহর। ডেভিডসন লিখেছেন, "শহর ঘিরে আছে যে জঙ্গল, তা এড়িয়ে চলবেন, বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়। এ বিষয়ে আমি তাঁদের সতর্ক করে দিচ্ছি। ওই সময় জঙ্গল ও শহরের সীমান্ত পেরুবার বা শহরে ঢোকার সময় শরীর হঠাৎ শিউরে ওঠে।"

উনিশ শতকের তিরিশের দশকে সিভিল সার্জন হিসাবে ঢাকায় এসেছিলেন ডাক্তার জেমস টেইলর। ঢাকার ওপর তথ্য সংগ্রহ করে ১৮৩৯ সালে পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করেন টেইলর। পরের বছর "টপোগ্রাফি এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অব ঢাকা" পুস্তকাকারে বের হয়। টেইলর ঢাকা সম্পর্কে লিখেছেন, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা যেখানে মিলেছে, তার প্রায় মাইল আটের ওপরে বুড়িগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত ঢাকা। নদীটি যেখানে গভীর ও উপযোগী বড় বড় নৌকা চলাচলের। বর্ষাকালে নদী ভরে যায় এবং বড় বড় মিনার ও অট্টালিকাশোভিত ঢাকা নগরীকে মনে হয় ভেনিসের মতো।

সেন্ট গ্রেগরিস হাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন ব্রাদার রবার্ট। প্রথম ঢাকা আসেন ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে, নদীপথে কলকাতা থেকে। সে সময় ব্রিটিশ এবং আমেরিকান সৈন্যরা ঢাকা থেকে চলে যাচ্ছিল। ১৯৬৮ সালে তিনি সেন্ট গ্রেগরিস হাই স্কুলে যোগ দেন। আমেরিকান নাগরিক ব্রাদার রবার্ট। ১৯৭৫ সালে বর্ণনা করেছিলেন তাঁর ঢাকার অভিজ্ঞতা ঃ "আমি প্রথম এসে যে ঢাকাকে দেখেছি ঢাকা এখন তার চাইতে অনেক বিস্তৃত, অনেক সফিসটিকেটেড। প্রথম ঢাকায় এসে একটি মাত্র বিশাল রাস্তা দেখেছি, সেটি জনসন রোড। নদী থেকে যুদ্ধের সরঞ্জাম বিমানবন্দরে নেবার জন্য একটা পথ সে সময় তৈরি করা হয়েছিল। স্টেশন ছিল ফুলবাড়িয়ায়। রমনা এলাকায় গোটা কয়েক দালানকোঠা ছিল। তেজগাঁও বিমানবন্দর সে সময় যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছিল। মগবাজার তখন এক গ্রামীণ হাট মাত্র। শুধু আহসান মঞ্জিলই ছিল হ্যান্ডসাম বিল্ডিং। নদীতে লঞ্চ দেখিনি কখনও। স্টিমার যেত গোয়ালন্দ পর্যন্ত। নদীতে চলবার একমাত্র উপায় ছিল গয়না নৌকা। ইসলামপুরের কয়টা পথ বাদে আর সব পথ ছিল সরু। ধোলাইখাল ছিল। সব মিলিয়ে সে সময়ের ঢাকা মনে হয়েছে ইন্টারেস্টিং। অনেক ভিড় ছিল না, অনেক যানবাহন ছিল না। সে সময় যদিও ইলেকট্রিসিটি ছিল তবু খুব কম দোকানে বৈদ্যুতিক আলো ছিল। প্রায় সব দোকানে রাতে জ্বলত 'কুপিবাতি'। রমনা-তেজগাঁও এলাকা সে সময় পুরনো ঢাকা থেকে ছিল বিচ্ছিন্ন। টঙ্গী ছিল ছোট্ট একটা এলাকা। সেকালেও যানবাহন বলতে পথে দেখা যেত শুধুই এক্কাগাড়ি। আমেরিকানরা যাবার সময় বিস্তর যুদ্ধের ট্রাক নিলামে বেচে গিয়েছিল। সেগুলোকে রদবদল করে বাস বানিয়ে নামানো হলো ঢাকার পথে। রিক্সা ছিল না একদম। ট্যাক্সি দেখেছি কিনা মনে করতে পারি না। ঢাকা থেকে বাইরে যাবার একমাত্র সড়ক ছিল নারায়ণগঞ্জের দিকে। ট্রেন ও গয়না নৌকা ছাড়া বাইরে যাবার পথ ছিল না। ওরিয়েন্ট এয়ার বলে একটা বেসরকারী বিমান কোম্পানিই বোধ হয় প্রথম ঢাকায় বিমানের সার্ভিস প্রবর্তন করে। পরে এলো পিআইএ।"

সেন্ট গ্রেগরিস হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন ব্রাদার হোবার্ট। যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ হোবার্ট ঢাকাকে দেখেছেন ১৯৪৮ সাল থেকে। ১৯৭৫ সালে ঢাকা সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা ঃ "সে সময় ভিক্টোরিয়া পার্কের আশপাশই ছিল সবচেয়ে ব্যস্ত এলাকা। কেনাকাটা করতে মানুষ আসত চকবাজারে। এখানকার সাহেব সুবাদের মতে, তখন কেউ নিউমার্কেটে যেত না। সেকালের সিনেমা হল ব্রিটানিয়ার পাশ দিয়ে নিউমার্কেটে যাবার একটা সরু পথ ছিল। তার আশপাশ কেবল জঙ্গলে ভরা। লাল ইটের বাড়িগুলোতে বিলেতি সাহেবরা থাকত। গুলিস্তান ছিল না। আজকের জিপিও ছিল পুরনো দালানে। মাছ পাওয়া যেত বিস্তর। আজকাল ঢাকায় সাপ দেখি না। আগে সাপ, বেজি, সজারু, এই শহরে দেখা যেত অহরহ। শিম, বেগুন, দু'আনা সের থেকে দশ পয়সা বাড়ল, ঢাকার মানুষ মাথায় হাত দিল। দু'আনা দিয়ে তরমুজ কিনে ভাবত হয়ত ঠকেছি। বিয়ের যৌতুক হিসাবে তখনও ট্রানজিস্টার আসেনি। জামাইরা প্রথমে দাবি করত রুমাল। তার পর বিয়ের বাজারে একটি র‌্যালি সাইকেল।"

ঢাকা এখন স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী। স্বাধীন দেশের রাজধানীরূপে ৩০ বছর বয়সে ঢাকায় আগমন ঘটেছে দুনিয়ার অনেক বিখ্যাত মানুষের। তাঁদের মধ্যে আছে রাষ্ট্রনায়ক, রাজা-রানী, শিল্পী, ক্রিড়াবিদ, বিজ্ঞানী। জাতিসংঘের দু'জন মহাসচিব ডক্টর কুর্ট ওয়াল্ডহেইম ও জেভিয়ার পেরেজ দ্য কুয়েলার ঢাকা সফর করেছেন। তৃতীয় বার জাতিসংঘ মহাসচিব হিসাবে এসেছেন কোফি আনান। ঢাকায় এসেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, ফার্স্ট লেডি হিলারি ক্লিনটন, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এসেছেন ঢাকায়। এসেছেন নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী প্রফেসর আব্দুস সালাম, মাদার তেরেসা, অমর্ত্য সেন, গুন্টার গ্রাস। কিংবদন্তির মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী এসেছেন ঢাকায়। এসেছেন হলিউডের নায়িকা অড্রে হেপবার্ন। এমনি আরও অনেকে। (শেষ)